Tomari Sarengi

Gargi Bhattacharya

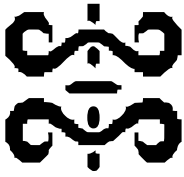

COPYRIGHTED MATERIAL

তোমারই সারেঙ্গী

গার্গী ভট্টাচার্য

If you don't get out of the box you have been raised in, you won't understand how much bigger the world is .

Angelina Jolie.

My website :

www.gargiz.com

লেখক বুদ্ধদেব গুহকে যাঁর লেখা পড়ে

আমি প্রকৃতি প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছি ।

সত্যজিৎ রায়, নিপুনভাবে আবহাওয়া প্রেডিক্ট করতে পারতেন ।

একটি গল্পে আমি সেটা ধরেছি ।

গার্গী, জীবনের লেখা লেখে জীবনমুখী ভাষায়-
অঞ্জন দত্ত (গায়ক, পরিচালক, অভিনেতা)

গার্গীর লেখা পড়লাম । সাবলীলতা ও স্বত:স্ফূর্ততার জন্য খুব ভালোলাগে ,মনে হয় আরো পড়ি । লেখায় একটি সারল্য আছে যেমন মা ও শিশুর সম্পর্ক কিংবা পক্ষীশাবক ও বাসায় ফেরা পাখী-মায়ের টান ; তাই খুবই আকর্ষণ করলো আমাকে লেখাগুলি ।

মৌসুমী চ্যাটার্জ্জী (অভিনেত্রী)

কিছু কথা ::

অনেকেই আমাকে বলেন আমি বাংলা আর ইংলিশ মিশিয়ে কেন লিখি ,তাদের আমি বলি যে আমি আজকালকার কথ্য ভাষায় লিখি কারণ আধুনিক যুগের লোকেরা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বুঝতে অক্ষম । বাংলা প্রায় উঠে যেতে বসেছে কাজেই এখানে ভাষার কারিকুরি বেশি দেওয়া অনুচিত । সহজ ভাষায় লেখা গদ্য লোকের মন ছুঁয়ে যায় ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাষাকে সমর্থন করতেন । অন্যধরণের ভাষাকে যা অতিরিক্ত অলঙ্কৃত তাকে উনি কৃত্রিম ভাষা বলতেন । ফিউশান ভাষাতেই আজকালকার মানুষ কথা বলে থাকেন । বাঙালী তিন প্রকার । পশ্চিমবঙ্গীয় , বাংলাদেশী ও প্রবাসী বাঙালী । আমি প্রবাসী বাঙালীদের জন্য লিখি । ওঁরাই আমার মূল পাঠক এবং তাঁরা ফিউশান ভাষাতেই বেশি অভ্যস্ত । কাজেই এই জাতীয় ভাষা আমি ব্যবহার করি ।

ভাষা সবসময়ই বদলায় । শেক্সপীয়ারের ভাষা কি আজ আধুনিক ইংলিশে চলে নাকি চর্যাপদের ভাষায় আমরা কথা বলি ? কাজেই ভাষাবিদেরা জানেন যে ভাষার পরিবর্তন হয় । এবং আমার ভরসা সেটুকুই ।

সারেঙ্গী একজন রূপসী মেয়ে যে থাকে এক গ্রামে । সবুজ গ্রামে । জ্ঞান হওয়া থেকেই সে সবুজ বৃক্ষাদি ভালোবাসে । শহরের ইটকাঠ পাথরে তার হাঁফ ধরে যেতো । তাই স্থির করে যে সে বড় হয়ে গাছপালা সমৃদ্ধ কোনো জায়গায় কর্মজীবন কাটাবে । পড়াশোনা হয় বড় শহরে , বড় আবাসনে বসবাস । বাবা এক স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করেন ইঞ্জিনীয়ারিং যেখানে জাতপাত দেখে নম্বর দেওয়া হতো । এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের নম্বর ওয়ান প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ধরে মানুষ ।

মায়ের ইচ্ছে ছিলো আইনজীবি হবার কিন্তু বাবার সঙ্গে বিয়ে হবার পরে চাকরি করতে পারেননি । কারণ বাবা এমনসব জায়গায় কাজ করতেন যে প্রচন্ড ব্যস্ত থাকতেন, ট্যুরে যেতে হত তাই মাকে সংসার সামলাতে হতো । আইনের প্র্যাকটিস্ করা হয়নি ।সারেঙ্গী নাম হয় মায়ের গানের শখ ছিলো তাই । ওরা তিন ভাই বোন । তিনজনের নামই হয়

সঙ্গীতের সাথে যুক্ত কিছু দিয়ে । যেমন ওর নাম সারেঙ্গী আর দুই ভাইয়ের নাম তান ও মালকোষ ।

ভাইরা একজন বাবার পথে গেছে অর্থাৎ ইঞ্জিনীয়ার আর অন্যজন মায়ের আঁচলেই আছে মানে আইনজ্ঞ । তবে সে নতুন ধরণের আইন নিয়ে কাজ করে , ধর্মীয় আইন । কারণ সে খ্রীস্টান হয়ে গেছে ।

বিয়ে করেছে একজন ফিরিঙ্গি মেয়েকে । তাই ধর্মান্তরিত হয়েছে । প্রায়ই গীর্জায় যায় ও তার সাথে যুক্ত এবং এই আইন নিয়ে কাজ করে ।

তার পত্নী স্টেলা খুব ভালো গান করে । গীর্জায় গান করে । যীশুর গান । ভক্তি গীতি ।

আর গীর্জা সংলগ্ন স্কুলে পড়ায় । ওদের বাড়ির বিদেশিনী বধূ । নীলনয়না , স্বর্ণকেশী , পক্ক বিম্বোষ্ঠী । সারেঙ্গীর পাতলা ঠোঁট। গায়ের রং এর দিক থেকে সে - গোধূম বর্ণা । ভূগোলেতে সে গোল নয় এক্কেবারে সেরা । তাইতো সে এতেই ডক্টরেট করে আবহবিদ্ হতে চায় । কিন্তু ভারতে লোকে যা চায় সবসময় কি তা হয় ? কাজেই বহু চেষ্টা চরিত্রে করেও যখন চাকরি পেলোনা তখন সে গ্রামের দিকেই চলে গেলো । মাইক্রো ফাইনান্সে কাজ নিয়ে সে এখন গ্রামে থাকে । বিয়ে হয়ে যায়

পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান করার আগেই । ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পরেই বিয়ে হয় বাবার দেখা পাত্রের সাথে । পরে ডক্টরেট করে । চাকরির চেষ্টা করে । পতিদেব বলেন , চাকরি করে ঘেঁচু হবে । সংসার করো । আর আমি তো প্রচুর কামাই !

বাড়ির মেয়েরা চাকরি করবে , বাইরে গিয়ে টাকাপয়সা কামাবে এটা ওদের বাড়ির রীতি নয় ।

কিন্তু সারেঙ্গী বলেছে যে চাকরি না করলে এমনি কিছু না কিন্তু ঝগড়া হলে তখন বলবে যে আমি তোমার ইনকামে খাই । আমি জানি । বলবেই । তাই আমি চাকরি না করলেও স্বনির্ভর হতে চাই । কারো দয়ায় বাঁচতে চাইনা ।

তা কামাতো বটে নিলয় । নিলয় সাহা । মাসে লাখের ওপরে মাইনে পেতো আজ থেকে ২৫ বছর আগে । খরচও করতো অনেক । তবে তার কাছে সোসাল স্ট্যাটাস্ , দামী ব্র্যান্ডের গাড়ি , ডিজাইনার কাপড় জামা , ফাইন মদিরার মূল্য অনেক বেশি নিত্য জীবনে । সেসব পূর্ণ হলে তবে সে দান করে । রাজা হর্ষবর্ধণের মতন গায়ের জামা খুলে গরীব কে দিয়ে দেয়না । আবার থপ্ খাবোও না ।

ওদের একটি ছেলে হয় । তাকে ভালো স্কুলে দেয় । কোনোরকম ত্রুটি রাখেনি মানুষ করার । সে এখন বাবার মতন কম্পিউটারে কাজ করে । বিদেশে থাকে । নিঁখুত জীবন । ফুল প্যাকেজ ।

গার্লফ্রেন্ড নিয়ে সহবাস করে । তাদের প্রেমে কোনো ফুল ফোটেনা কারণ মাঝে থাকে সুস্বাদু কনডোম ! অভিজাত বহুতলের কৃত্রিম বাগিচার মতন !! বিদেশে গ্র্যাজুয়েশান পড়েছে । তখন থেকে মাকে মাম্মি ও বাবাকে ড্যাড বলে । বাবা আপত্তি না করলেও সারেঙ্গী বলেছে , আমাকে মা যদি না বলতে পারো তাহলে ডেকোনা । নিজের শিকড়কে ভুলে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয় । তুমি ওখানে ভালো জিনিস শিখতে গেছো । নিজের ভালো জিনিস খোয়াতে যাওনি ।

স্বামীর কাজ করতে না দেওয়া এবং জীবনকে টাকাপয়সা দিয়ে জরিপ করায় খানিকটা হতাশ সারেঙ্গী । ওর স্বামী নিলয় উপহারের দাম দেখে তবে খুশি কিংবা অখুশি হয় । উপহারটা যে কারো মনে করে আনা একমুঠো শুভেচ্ছা সেটা ভাবেনা ।

অহেতুক জিনিসগুলোকে জটিল করতে নিলয়ের জুড়ি নেই । সোজা জিনিসকে সোজা দেখতে যেন সে অক্ষম । কতকটা তারজন্যই বিবাদের সুত্রপাত ।

পরে আরো নানান সমস্যা হয় । ছেলেকে মানুষ করার ধরণ নিয়েও সমস্যা শুরু হয় । আসলে এরকম **অর্থই সব** এমন এক মানব সন্তানের সাথে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে উঠতে পারেনা সারেঙ্গী । সবসময় তার মনে হতে থাকে যে সে একজন খুবই রং চটা মেশিন বিশেষ । সে কোনো ধনীর সন্তান নয়, রাজকন্যে নয় এমনকি প্রখ্যাত মানবীও নয় । কাজেই তার অস্তিত্বের কোনো মুল্যেই বুঝি নেই তার পতি পরমেশ্বরের সমাজের মানুষগুলোর কাছে যারা দামী মদিরা , মাদকদ্রব্য ও অভিজাত মহলে বসবাস করাকেই জীবনের চরম মাপকাঠি বলে গণ্য করে । তাদের দুনিয়ায় দু জাতের মানুষই হয় । গরীব ও বড়লোক । রাজা ও চাকর কিংবা সিংহ ও মাংস । খাদ্য ও খাদক ।

নিলয় তার পুত্রকে মানুষ নয় মেশিন করতে আগ্রহী । কিন্তু সারেঙ্গী ভেবেছিলো তাকে মানুষ করবে । কিন্তু সে একটু স্বার্থপর তৈরি হয়েছে , আগে নিজের সুখশান্তি দেখে তারপর কাজ করে । যেটা সারেঙ্গীর মোটেই পছন্দ হয়না । মাকে মুখের ওপরে **হাঁদা , ইমোশনাল ফুল বলে দেয় ।**

এইসব কারণে ও আর স্বামীর সঙ্গে থাকেনা । আইনত বিচ্ছেদ হয়নি কিন্তু আলাদা থাকে । আর

নিলয় ওকে চাকরি করতে বারণ করে কিন্তু ও নিজের মায়ের মতন শিক্ষিতা হয়ে গৃহবধূ হবেনা কোনো মতেই - তাই মাঝবয়সে এই কাজ নিয়ে গ্রামে চলে আসে আর তার আগে পকেট মানির জন্য অন্য কাজ করেছে । ওর কাজ হল গ্রামের উৎসাহী মানুষদের লোন দেওয়া । একটি প্রাইভেট সংস্থার হয়ে ও লোন দেয় । আরো বেশ কয়েকজন অফিসার আছে । তার মধ্যে ও হল সবচেয়ে জনপ্রিয় । তার কারণ ও সবচেয়ে বেশি শিক্ষিতা , গোল্ড মেডেলিস্ট বিএ ও এম-এস-সিতে আর ও সুন্দরী , সুবক্তা ও চারুশীলা । অন্যরা পুরুষ । আর একজন মেয়ে আছে তবে সে বাঙালী নয় । ভালো মেয়ে । কিন্তু সারেঙ্গীর কাছে কিছু না ।

স্বামীর থেকে দূরে থাকলেও সে যোগাযোগ রেখেছে কারণ ওদের একটি সন্তান আছে । আর স্বামী একটু ক্ষ্যাপাটে । তার গুচ্ছের কাজের লোক আছে কিন্তু মাঝেমাঝে সারেঙ্গী গিয়ে সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসে । মনের দিক থেকে নৈকট্য না থাকলেও পার্থিব জগতে এখনও সে ওর কাছের মানুষ ।

তা বটেই তো ! তাই বুঝি প্রতি সপ্তাহে একটি করে ইমেল লেখে নিলয়কে । আর সেই ইমেলেই লেখে ছয়জন অনবদ্য নারীর কথা যাদের সাথে

পরিচয় হয়েছে তার এই গ্রামে এসে । তারা সবাই সাধারণ মানুষ অথচ অসাধারণ । নিলয় পড়ে অবাক হয়েছে । লিখেছে সংক্ষিপ্ত কটি লাইন উত্তরে ---

সত্য সেলুকাস্! কি বিচিত্র এ জগৎ ।

নীচে ইমেলের সারাংশ দেওয়া হল ।

সাইন ইন

প্রথম ইমেল

হংসিনী

হংসিনী যে কারো নাম হতে পারে জানা ছিলো না সারেঙ্গীর । ও প্রথমে ভাবে যে কোনো হাঁসের ফিমেল ভার্সান কোথাও রয়েছে । কিন্তু পরে জানতে পারে যে এ এক অনবদ্য নারী । কত বছর যে সে কথা বলেনি তার কোনো ঠিক নেই । মাথায় জটা । পরণে লাল হাঁটু অবধি কাপড় । লাল কাঁচুলি । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন তাকে ব্রাউজ বলাই বোধহয় শ্রেয় কারণ এত সংক্ষিপ্ত কাপড় সেখানে । আর কাপড়টি মালকোঁচা দিয়ে পরা কতকটা মারাঠী স্টাইলে ।

ভোরের কুয়াশার মাঝেই পুরুষ গাছিদের সাথে গাছে উঠে রস পেড়ে এনে গুঁড় তৈরিতে হাত লাগায় কিন্তু একটিও কথা বলে না । একটি ভাঙা মন্দিরের দালানে থাকে । ঘরের ভেতরে বাস করে । বারান্দায় রাঁধে বাড়ে । এই গ্রামে শীত তেমন বেশী তো পড়েনা । মাঝামাঝি । তাই বুঝি ওর তত কষ্টও হয়না । সারাদিনে একবারই খায় । সূর্য ডুবলে আগুন জ্বালিয়ে নেয় শুকনো ঘাসপাতা জুটিয়ে । তাতে রান্না হয় । সেদ্ধ ভাত বা খিচুড়ি কিংবা রুটি ও বেগুন পোড়া । যেদিন যেমন । আর অনেক সময় গ্রামের লোকেরা তাকে নানান খাবার দেয় কারণ সে হাত দেখে দেয় । যা বলে(স্লেটে লেখে কারণ কথা বলে না) মিলে যায় ।মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হয়ে যায় । সপ্তাহ খানেক দেখা মেলে না । আবার এসে জোটে ।

কোনো পুজো টুজো করেনা । আরাধ্য দেবতা বলতে একটা উঁই ঢিবি । সেটারই অর্চনা করে ।

আলতা, সিঁদুর , চন্দন লেপে টেপে একাকার । ওর ওপরে একটা তুলসী গাছও পোঁতা । ঢিবিকে শাড়ি জড়িয়ে রেখেছে মানুষীর মতন ।

উঁইঢিবির নাকি অনেক ক্ষমতা । আধ্যাত্মিক । এর পরশে মানুষের মন্দ ও ভালো দুই-ই হতে পারে ।

এর অর্থ হল উত্তরণ , সাহস , ধৈর্য্য , হার না মানা , রূপান্তর ও পরোপকার । উঁইপোকার থেকে এসব শেখার আছে । ওদের শক্তি বা উর্জা বা এনার্জি এগুলি শেখায় আমাদের ।

এই হংসিনী অবশ্যি মরা মানুষও বাঁচাতে পারেন শোনা যায় । দুটি পাখি ও একটি হরিণ শিশুও বাঁচে ওনার কৃপায় । পাখি দুটির গল্প আজব । একজন বেঁচে ওঠে ওনার স্পর্শে অন্যজন মৃত অবস্থা থেকে জীবিত হলেও আবার মারা যায় কারণ ওনাকে বলে যায় আমি মরে গিয়ে অন্য দেহ নেবো কারণ আমার কর্ম ফুরিয়ে গেছে তা তুমি আমাকে আটকে রাখছো কেন ? হরিণটিকে বাঁচানো হয় । সে এখন শিশু থেকে পরিণত বয়স্ক । বনে চলে গেছে । তবে মহিলার বক্তব্য যে ওপরওয়ালা না আদেশ দিলে উনি এরকম কিছু করেন না । ইশারায় কিংবা স্লেটে লিখে বাক্যালাপ চলে ।

দুটি সাপে কাটা রুগীকে বাঁচানো হয় এবং একজন কোমাতে আক্রান্ত মানব সন্তানকে । চিকিৎসকেরা তর্ক করতেই পারে যে এরা এমনিই হয়ত সুস্থ হয়ে যেতো ওষুধ পথ্যি পড়লে কিন্তু এদের নাড়ী চলাচল বন্ধ হয় ও মড়া পচন ধরার অবস্থায় চলে

আসার সময় অর্থাৎ রিগার মর্টিস শুরু হবার পরেই লাশ নিয়ে আসা হয় হংসিনীর কাছে।

--সি ইজ ম্যাজিকাল অ্যান্ড সেলেসিয়াল । ভাবে সারেঙ্গী । কিন্তু একে নিয়ে এক লাইনও লেখেনি কোনো নামী ম্যাগাজিন যারা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট করে চিল্লায় । ওদের নারী শক্তির অগ্রগতির পরিমাপ হল কে কতবার বিয়ে করেছে , লম্পটের শয্যায় গিয়েছে , জুয়া ও মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়েছে এবং বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের মা হয়েছে ওয়েট আ মিনিট , প্রেমের সন্তান নয় সে একটি উচ্ছৃখলতার কারণে জারজ অ্যান্ড দা লিস্ট গোজ অন ---।

মহিলাটির গলায় কোনো রুদ্রাক্ষের মালা টালা নেই । কপালে বড় লাল টিপ । বাঁহাতে তামার বালা।

মধ্য বয়সী । আর ডান হাতে বিরাট একটি হাঁসের উল্কি । হয়ত তাই লোকে হংসিনী নামে ডাকে ! কে জানে ! হাঁসটা উড়ছে । গগনে । ডানা মেলে । মহিলা তো কোনো কথা বলেনা । তাই কোথা থেকে এসেছে কেউ জানেনা । কতদিন এখানে থাকবে , কেন এসেছে কেউ কিচ্ছুটি জানেনা । তবে কাগজে প্রশ্ন লিখে রেখে গেলে উনি মন্দিরের গায়ে/স্লেটে হিন্দি ও বাংলায় উত্তর লিখে রাখেন

যার থেকে বোঝা যায় বাংলা জানেন । অনেকে তাকে বড় গণৎকার ভাবে । কিন্তু সঠিক কেউ কিছু বোঝেনা ।

মহিলাটির একটি পোষ্য আছে । একটি জংলী বিল্লী । সেও সমান আকর্ষণীয় ! কোথাও হাঁড়ি মারেনা । মালকিন যা দেয় তাই খায় । আর খুব ঘুমায় । একেবারে কুম্ভকর্ণের মতন ।

আর একজন মস্ত বড় মানুষ আসে এদের কাছে । সে যে কে তা নাই বা লিখলাম কিন্তু তাকে চেনেনা এমন কেউ ভারতবর্ষে নেই । তার একটু বয়স হয়েছে কিন্তু ফিট্ মানুষ । ভালোমানুষ । মন্ত্রী সান্ত্রী গোছের আর কি ! একটা ফোনের অনেক দাম ।এখানে এসে চুপটি করে বসে থাকেন ঐ হংসিনীর সম্মুখে । মন্দিরের বারান্দায় । সবাই দেখে । কোনো সিকিউরিটি নেই তার এখানে । কেউ সামনে যায়ও না । সই-টই চাইতে । কেননা রহস্যময়ী হংসিনী তাঁর সামনে বসে আছেন যে !

ঘন্টার পর ঘন্টা দুজনে চুপ করে বসে থাকেন । সবাই দেখে যায় । তারপর সেই মহামানব উঠে চলে যান । গত চার-পাঁচ বছর ধরে এই চলছে । ক্রমাগত । আর আশ্চর্য হল খবরের কাগজের লোক কিন্তু আসছে না ! যিনি আসছেন তাঁর

বাজারে ভালই তো নাম অথচ এমন খবর কভার করতে কেউই আসছে না !

অবাক করার মতন কান্ড ।

দুজনে যখন নীরব হয়ে বসে থাকেন তখন মজা দেখার জন্য একবার গ্রামের দুষ্টু ছেলে হরিশ একটা

লম্বা লাঠি দিয়ে হংসিনীকে খোঁচায় । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা ! কোনো শব্দই করেননি তিনি । যেন শান্তির আঁঠা দিয়ে আটকে আছেন দুজনে ।

নি:স্তব্ধতা বয়ে চলে বাতাসে বাতাসে একই ভাবে ।

পিছলে যায় কৌতুহলী মন সবার সেই আজব দর্পণে । চারপাশের অদ্ভুত নৈ:শব্দ কেমন যেন আস্তে আস্তে এক একটা প্যাঁচা হয়ে যায় ,যা কিনা ধী ও আদিম শক্তিতে ভরপুর । সপ্তর্ষি মন্ডলের গা ঘেঁষে উড়ে যায় একটি কবুতর, যার রং রামধনুর মতন- কেন কে জানে ।

দ্বিতীয় ইমেল

নূর

এক বিদেশিনী থাকে এই গ্রামে । গ্রামটি পাহাড়ে ঘেরা । চারদিকে পাহাড় । শৈশবে আঁকা ত্রিকোণাকৃতি পাহাড়ের মত ।বেশ কয়েকটি রেঞ্জ আছে পাহাড়ের । নানান ভেষজ পাওয়া যায় । শীতল বাতাস । দেবদেবতার মন্দির চূড়ায় ঢাকা । অনেকে ট্রেক করতেও যায় । পাদদেশে গ্রামবাসীরা নিজ কুটিরে রান্না করে রাখে যা সামান্য অর্থের বিনিময়ে ট্রেকারদের বিক্রি করে । প্রচুর বাইরের লোকও আসে ট্রেক করতে । কেউ কেউ এই গ্রামে থেকেও যায় । সুজলা , সুফলা , পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম । **নাম রাজামুদ্রা । কি সুন্দর না নামটা ?**

এই বিদেশিনী আসে সুদূর ডুবাই থেকে । দেখলে মনে হয় মেমসাহেব । মাথার চুল সোনালি আর গায়ের রং দারুণ সফেদ । হলুদই বলা যায় ।

চলন বলনে পাক্কা মেমসাহেব । এই দূরদেশে কেন জানতে চাইলে বলে যে একাকী থাকতে ভালোবাসে তাই নির্জনে এসে বাস করছে ।

স্বামী ছিলো । সন্তান নেই । ভদ্রমহিলা ইসলাম ধর্মাবলম্বী । রোজ নমাজ পরেন । রোজা ইত্যাদি করেন । মসজিদের ইমামের সাথে কথাবার্তাও বলতে দেখা গেছে । ডুবাই থেকে এলেও তার জন্ম অন্য এক মধ্যপ্রাচ্যের দেশে । সেই দেশের নাম উল্লেখ করেনি । তার নিজের সুরক্ষার কারণে ।

খুবই লাজুক প্রকৃতি এমনিতে । দানশীলা । মসজিদে দান করে থাকে । গ্রামের দরিদ্রদের মুক্ত হস্তে দান করে ।

অনেক টাকা এনেছে যা ব্যাঙ্কে আছে তাই দিয়ে চালায় আর খুব ভালো সেলাই করে ভীষণ ভালো নক্শা কাটা জামা কাপড় বানায় , শেপ ,স্টাইল দেখলে মনে হয় বিদেশী পোষাক যা গ্রামের সাথেও যেন কেমন স্বচ্ছন্দে মিলে যায় কোনরকম কদর্য মনে হয়না অথচ নব্যযুগের কেতাদস্তুর লাগে বটে । তাই বেশ জনপ্রিয় একটি দোকান চালায় ।

সেই সুত্রেই আলাপ সারেঙ্গীর সঙ্গে । আর অল্প সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহ আছে মহিলার । ওরা যেখানে

থাকতো সেখানে নাকি ওরা ঘুঙুর বাজিয়ে বাজিয়ে গান করতো। কিন্তু সেটা ধাতুর ঘুঙুর হতো।

এখন সারেঙ্গীর সাথে মাঝে মাঝে গান করে।

গুটিকতক আরবী শব্দও শিখেছে সারেঙ্গী ওর দৌলতে, মারহাবা, হাবিবি এইসব।

নাম বলে নূর হায়াৎ। কত যে সেলাই এর আইডিয়া এর মাথায় খেলে ভাবা যায়না। যেমন সারেঙ্গী একটা চন্দন রং এর আর আকাশী রং এর শাড়ী কিনেছিলো যা পুরো ব্ল্যাঙ্ক। নূর তাতে নক্শা করে করে পুরো রামায়ণ এর গল্প ও উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের সব সিনেমার সুন্দর সিনগুলো তুলে আনলো অবশ্যই সারেঙ্গীর ইচ্ছেই।

কিন্তু আইডিয়া ওরই। ওই বলে যে কোনো মাইথোলজি বা প্রিয় গল্পকে এইভাবে শাড়িতে ধরতে পারো। ধৈর্য্য ধরে করেও। আর পয়সাও নিলো না, বললো-তুমি আমার বন্ধু, পয়সা নেবো কি গো?

এমনই রোদ্দুরে মেলে ধরা যায় এই মেয়েকে, ফাটাফাটি মেয়ে এই নূর। যেন কোনো অচেনা দেশ থেকে এসে এই পাহাড়িয়াতে নিজেকে মেলে ধরেছে

এই পরী , হুর , নূর ! সোজা আকাশ থেকে নেমে এসেছে ।

সবথেকে ভালোলেগেছে ওর হাতের বিশেষ ধরণের এক চালের পায়েস । ছাগলের দুধ দিয়ে করা এই মিষ্টান্ন অপূর্ব । যেন নূরের চেয়েও বেশি মিষ্টি ।

এত কিছু সত্ত্বেও বার বার একটা প্রশ্ন মনে থেকেই গেছে যে মেয়েটি এতদূরে এসে উঠেছে কেন ? মধ্যপ্রাচ্যে কি আর সবুজ , সতেজ পাহাড়িয়া গ্রাম নেই ? কিন্তু আমাদের মনে সব সময় কিছু না কিছু প্রশ্ন আসেই , কৌতুহল থাকেই কিন্তু সেগুলো চাপা পড়ে যায় । আবার ওঠে আবার চাপা পড়ে যায় ।

তবে ভাগ্যের পরিহাসে কিনা জানা নেই একদিন সব কৌতুহল মিটে গেলো ।

দিনটা ছিলো অমাবস্যা । ঘোর অমাবস্যা । পাশের মানুষকেও দেখা যাচ্ছেনা । এমনই অন্ধকার চারদিকে । হাল্কা শীত পড়েছে সবে । এই অঞ্চলে খুব একটা বেজায় শীত পড়েনা তবে মোটামুটি ঠান্ডা তো পড়েই । বাসার পেছনে উঠোনে কাঠকুটো জ্বালিয়ে বসে আগুন শেঁকছে সারেঙ্গী ও তার বন্ধু কাম টেলার নূর । চাকর ও তার বৌ মাংসের

কাবাব রেডি করছে । ওরা আজ রাতে খাবে । সঙ্গে নানান সবজি , সেগুলো পর্যন্ত রোস্ট করে নেওয়া হবে । আর ঘরে তৈরি দই । এই দই অবশ্যি নূরের পরামর্শে বানানো হয়েছে । এর নাম কেফির । তাদের দেশে নাকি এসব খায় । মজার ব্যাপার হল হাল্কা ওয়াইনের আয়োজনও আছে । সে মুসলিম হলেও মদ্যপান করে জানা গেলো । তবে ওয়াইন খায় । হুইস্কি বা ভদ্‌কা খায়না বা মাদক দ্রব্যে আসক্ত নয় । ওরা পোর্ট ওয়াইন খেলো । খুবই অল্প নেশাতুর অবস্থায় যেন মহিলা বলে চলে তার কাহিনী । হয়ত ইচ্ছা করেই বলে নিজেকে হাল্কা করার জন্য । হবেও বা কারণ এসব চেপে রাখলেও তো গিল্ট ফিলিং হয় তা থেকে মানসিক অবসাদ ও মুসলিমদের আবার জাজমেন্ট ডের কনসেপ্ট শেখানো হয় যে মরণের পরে যমরাজ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কে ফেস করতে হবে ইত্যাদি হয়ত তাই বলে ওঠে যে তার স্বামীকে নাকি সে নিজে হাতে খুন করেছে । নূর নাকি ভালো রান্না করতো । আর পেশায় ছিলো নিউট্রিশনিস্ট । রীতিমতন পড়াশোনা করে ডিগ্রী নিয়েছে এই ব্যাপারে । কাজও করেছে বিয়ের আগে অবধি । কিন্তু বিয়ে হয় এক আর্মি অফিসারের সাথে । দূর্দান্ত অফিসার । যার কাজ ছিলো মিডিল ইস্টে সরকারের হুকুমে

সন্ত্রাসবাদী তৈরি করা । আর বোমাবাজি করে লোক মারা । কিন্তু সেই বোমাবাজিতে এদের নিজেদের প্রিয়জনেরা মারা যেতোনা । এদের উদ্দেশ্য হল সারা দুনিয়াতে সন্ত্রাস ছড়িয়ে গোটা পৃথিবীকে ইসলাম ধর্মে পরিবর্তন করে ফেলা । আর তার মাথা হল ওর স্বামী । একের পর এক টেররিস্ট তৈরি করতো সে আর বোমাবাজি করে মানুষ খুন করতো । নূর কতবার বারণ করেছে । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । তার অর্থ চাই , পাওয়ার চাই । ইচ্ছে করলেই সে পারতো অন্য কোনো কাজ নিতে কিন্তু সে করেনি । কারণ তার ততদিনে বেজায় নাম হয়ে গেছে । তাই নূর নিজে হাতে তাকে খুন করে । তবে গল্পটা এতটা সহজ নয় ।

ওকে জিজ্ঞেস করাতে যে স্বামীর সাথে সম্পর্ক কেমন ছিলো সে বলে যে , মাই হাজবেন্ড লুকড্ লাইক আ ড্যাম্ হাজবেন্ড। আমাকে হালয়া আল জাহার বলে ডাকতো । মানে একধরণের মিষ্টি । হালুয়া হালুয়া গো । তোমাদের গাজরের হালুয়া কিংবা সুজির হালুয়া হয়না ? সেই হালুয়া ।

আর আমি তাকে বলতাম ,ইউ আর অ্যান অ্যানিম্যাল । অ্যান্ড আই লাভ বিস্টস্ ।

মুখে যাই বলি না কেন আমার জীবনটা তখন অটো পাইলটে চলতো । বেঁচে আছি কিনা বুঝতাম না ।

একটা জঘন্য পাশবিক লোকের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম যার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয় ।

আদতে একদিন তাকে খুন করার মতলব করে দেশের সরকার কারণ ততদিনে তারা তার থেকেও ভালো আরেক ক্যান্ডিডেট পেয়ে গেছে । তাই তাকে সরিয়ে দেবার ফন্দি আঁটে আর তখনই বাবুর টনক নড়ে যে কেউ অবিনশ্বর নয় আর বদলই একমাত্র সত্য । তখন দেশের সরকারকে গালিগালাজ ও দোষারোপ করা । যতক্ষণ অন্যের ঘাড় দিয়ে যাচ্ছিলো ততক্ষণ সব ঠিক ছিলো যেই নিজের ঘাড়ে চলে আসে তখনই চিত্রটা বদলে যায় । অত্যন্ত বিচক্ষণ হওয়ায় সে যাত্রায় রক্ষে পায় তার স্বামী ; মৃত্যু ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসে আগেই ।তার চর তাকে সংবাদ দিয়ে দেয়।

আর তার পরেই মানুষটি ভীষণ ভেঙে পড়ে । প্রথম বোঝে মৃত্যুভয় কাকে বলে । বুকের ভেতরে একটা নিদারুণ যন্ত্রণা । কুচক্রীর পাশার চাল ও চক্রবুহ্যে ফেঁসে যাওয়া তার অহংকে প্রচন্ডভাবে আঘাত করে । অবসাদ গ্রাস করে এই বীরপুরুষকে । কিন্তু তার

বাসায় ছিলো আরেক বাস্তু ঘুঘু । ধীর ধীরে সে তাকে শেষ করে দেয় । খাবারের মাধ্যমে ।

খাবার যেমন আমাদের সুস্বাস্থ্যের উৎস সেরকম খাবারই আমাদের মৃত্যুরও কারণ । অখাদ্য ও কুখাদ্য থেকেই তো যত রোগভোগ হয় ।

নিউট্রিশানিস্ট তো সবই জানে । কাজেই খাবারের নামে বিষ প্রয়োগ করতে থাকে সৈনিকের দেহ ।

সেনাপ্রধান যখন নূরকে বিবাহ করেন তখন শর্ত ছিলো একটাই , **এরকম কাউকে বিয়ে করতে চাই যে আমার দেখাশোনা করবে ও আমাকে বিশ্বাস করবে ।**

আর একটু বেশি বয়সে পাণিগ্রহণ করেন সেনাপ্রধাণ কারণ বড্ড কাজপাগলা । সর্বসেরা হবেন না ?

কাঁচা টাকার মালিক হবেন , ওয়েলদি হবেন ! রিচ্ হয়ে অর্ধনগ্ন নারীদের নিয়ে মদ্যপ অবস্থায় নাচবেন ! নাহলে আর কি হল ? টেররিস্ট ফান্ডে টাকা দেবেন ! ধনী ব্যাক্তিরা ছাড়া আর কেউ মানুষ নাকি বটে ? যেন তেন প্রকারেণ ধনী হও । আর সবাইকে ট্রাকের নিচে ফেলে দাও । গুঁড়িয়ে দাও । তাই না ? দরকার হলে মা বোনের ইজ্জৎ বিক্রি

করো । মেয়ের ও মায়ের কলঘরে গুপ্ত ক্যামেরা লাগাতেও দ্বিধা বোধ করোনা ।

তাই হিস্ট্রি রিপিটস্ ইটসেল্ফ - ঘর শত্রু বিভীষণই ডেকে আনে কাল । খাবারের নামে দেহে যা আদতে বিষ বলে পরিগণিত হয় সেইসব খাদ্যদ্রব্য খেয়ে খেয়ে ভদ্রলোক শেষকালে একদিন পটল তোলেন । চিকিৎসক দেখেন যে ওনার রক্তে সমস্যা হয়েছে । এই হয়েছে সেই হয়েছে । ভিটামিন /লোহা/মিনারাল কম বেশী ওঠা নামা করছে ইত্যাদি । **আদতে পুষ্টি পটিয়সী পত্নী করেছে জাদু । মেরেছে শব্দভেদী ভোজন বাণ যাতে শব্দভেদ করেছে তীর ও ঘায়েল হয়েছেন পতিদেব অস্ত্র যকৃৎ নিয়ে ও পতিত হয়েছেন যম দুয়ারে ।**

সেনাপ্রধাণ খুবই বিশ্বাস করতেন পত্নীকে । কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে নিজ দয়িতাই শঙ্খচূড় হয়ে দেখা দেবে তাঁর জীবন ময়দানে বা বলা ভালো সমর ক্ষেত্রে । লাইন অফ ফায়ার ও লাইন অফ কন্ট্রোল আদতে তার বেডরুমেই বসে আছে ।

--আমার কোনো আক্ষেপ নেই জানো সারেঙ্গী ? আমার কোনো পাপবোধ নেই কারণ আমার মনে হয় আমি একটা ভালো কাজ করেছি । না ওদের নীতি সঠিক বলে মনে করি না ওদের পন্থা ।

একজন সুস্থ মনের মানুষ হিসেবে আমি এর থেকে বেশি কিইবা করতে পারতাম বলো ?

আর জাজমেন্ট ডে? আমার মনে হয় আল্লাহোতল্লাহ্ আমাকে গোল্ড মেডেল দেবেন এর জন্যে । আর যদি তা না হয় তাহলে বলবো **গড ইজ আ সাইকোপ্যাথ ।**

সারেঙ্গী এই মহিলার থেকেই জানতে সক্ষম হয়েছে যে ইসলাম ধর্মে কোনো পৌত্তলিকতার ব্যাপার না থাকলেও ওরা অনেক সময় নানান চিত্র ব্যবহার করে আরাধনা করে থাকে । কতকটা গ্রাফ পেপারে আঁকা গ্রাফের মতন । খুব সুন্দর । তবে সেগুলি নানান গোষ্ঠির মধ্যেই সীমিত । নূর হায়াত ওকে সেগুলি দেখিয়েছে । ওর মোবাইলে তোলা আছে সেসব চিত্র ।

সারেঙ্গী বলে ওঠে , আমি মদিনায় যেতে আগ্রহী কিন্তু ওরা আমাকে ঢুকতে দেবেনা । নূর বলে ওঠে , নাজাফে যাও , কারবালায় যাও , ইমামদের কাছে যাও ।

নবী মহম্মদ ও ইমামদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই ; ভেদ আমাদের মনে । ওনারা সবাই

জ্যোতি । তাই সীমারেখা ভেঙে ফেললেই দেখবে জগৎ কত সুন্দর ।

আকাশে কতনা তারা দেখা যায় । কে বড় কে ছোট সেটা কি মাপা যায় ? আমরা তারার আবেশেই বুঁদ হয়ে বাঁচি আর সেটাই জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যায় । কঙ্কাল ও নগ্নতা মানুষ্য জীবনকে বড় নিঃস্ব করে দেয় । তাই আজ এত মানসিক রুগী চারদিকে । কারণ আমরা তারাদের দেশ থেকে দূরে চলে এসেছি । চারিপাশে কেবল র‍্যাট রেস আর নকলের ভীড় । বাঁচতে গেলে একটু তারাবাজিরও যে প্রয়োজন তাইনা বন্ধু ? বলে ওঠে নূর যার নামের অর্থ আলোর দ্যুতি যেমন চাঁদের আলোর স্নিগ্ধ মধুরতা ।

- **রিয়েলিটি, রিয়েলিটি, রিয়েলিটি , আই অ্যাম টায়ার্ড অফ রিয়েলিটি অ্যান্ড ফাকিং র‍্যাট রেস !!**

মদিরার আবেশ জড়ানো কন্ঠে বলে ওঠে নূর হায়াত তার হাস্কি ভয়েসে, দিগন্ত কাঁপিয়ে- অত্যন্ত চাপা স্বরে ।

তৃতীয় ইমেল

চকোরি

চকোরি একটি আদিবাসী মেয়ে । ওদের সাথে সাধারণ গ্রামাবাসীর প্রতিবছরই ঝামেলা হতো পুজোর সময় । কারণ হিন্দুরা মূর্তি পুজো করে কিন্তু ওরা প্রকৃতির উপাসক । তবে আধুনিক যুগে যেই ঝামেলার জন্য কাগজেই খবর প্রকাশিত হল তাহল এই যে ওদেরকে প্যান্ডেলেও ঢুকতে না দেওয়ায় ওদের মধ্যে এক পান্ডা নিজেই ঠাকুরের মূর্তি গড়ে পুজো করে ও প্রসাদ বিতরণ করে । এই নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায় । এই পান্ডার মেয়ে চকোরি । সে কলেজেও পড়েছে । বি-এ পাশ করেছে ইতিহাস নিয়ে । অনার্স । গান শিখেছে ।

নজরুলের গান অসম্ভব প্রিয় । বিশেষ করে ;কারার ঐ লোহকপাট , ভেঙে ফেল কররে লোপাট ---

এইসব বিদ্রোহী গান তার খুব ভালোলাগে । ইচ্ছে আছে নজরুল গীতি শিখে এই নিয়েই কিছু করার । নজরুলের আত্মীয় নূপুর কাজির গান দেখে থাকে ইউ -টিউবে ।

আর ওর মরদ হাবিশ হল অভিনেতা । ওদের মুখোশ নাচ আছে । ওরা বলে মুখা নাচ । এই এত্তো বড় বড় মুখোশ পড়ে গায়ে রং টং লাগিয়ে , উপযুক্ত পোশাক পরে ওরা নানান সাজে সেজে অভিনয় করে ।অনেকটা যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি । কেউ দানব সাজে কেউ রাজা কেউবা রাণী তো কেউ রাক্ষসী এরকম তবে বিদুষক একজন থাকেই । এবার হাবিশের মাথা থেকে বেরিয়েছে যে এই মুখা নাচে নতুনত্ব আসুক তাই সে রাক্ষস , খোক্কস্ থেকে বার হয়ে বাবু, গিন্নী , মোবাইল বিক্রেতা , অফিসের যাত্রী ইত্যাদি চরিত্র তৈরি করে করে মুখোশ বানায় । মুখোশ গুলো এই এত্তো বড় বড় একদম মানুষের অর্ধেক সাইজের ।

তাই নিয়েই ওদের মধ্যে গোলমাল হয় । পুরোনো পন্থীরা এগুলো মেনে নিতে পারেনা । কারণ এই নাচ ওদের একধরণের সংস্কৃতি বলা চলে । তার রদবদল করতে কেউ রাজি নয় । এরই ভেতরে গ্রামের ভোট বিশারদ এক দলনেতা একটু

তালগোল পাকায় তাতে চকোরি ও হাবিশকে থানায় ধরে নিয়ে যায় । আগে পুজো টুজো নিয়ে তো গোলমাল হতই তারপর চকোরির বাপ্ নিজে পুজো করে সেটা একটা খাপছাড়া কাজ তার ওপর হাবিশের এই সমাজ পরিবর্তন করার চেষ্টা তাদের কলাকে বদলে ফেলে-- এই ব্যাপারটা যেন কিছু সভ্য মানুষের বরদাস্ত হয়না । কিছুটা তারাই কলকাঠি নাড়ে । আর চকোরি মেয়েটি খুবই ফ্রি স্পিরিট সেটাও একটু বেখাপ্পা লাগে অনেকের । তাই তদন্তের পরে হাবিশকে ছেড়ে দিলেও যেহেতু চকোরির সামনের দিকে, নীচের পাটিতে একটি সোনার দাঁত পাওয়া যায় সেই নিয়েই ঝামেলা শুরু হয় । গরীবের মেয়ে , আদিবাসী মেয়ে সোনার দাঁত কী করে বাঁধালো ? সন্দেহ যায় তার দিকে যে সে মাওবাদী কোনো দলের সাথে জড়িত । কোনো প্রশ্ন বা উত্তরের পালা সাঙ্গ না করেই তখন তাকে ধর্ষণ করা হয় এবং গ্যাং রেপ । লজ্জাবতী লতা না হয়েও সে সহসা মূর্চ্ছা যায় !

মেয়েটির বিয়ে খুবই কষ্টে হয়েছিলো হাবিশের সাথে কারণ যদিও সে পড়েছে তবুও সে পড়ার সাথে সাথে ঘরামির কাজ করতো । তার বাবার সাথে ।

তার বাবা ছিলো বাড়ি তৈরি করার মিস্ত্রীদের কন্ট্রাক্টর । এবং মেয়েরা যেমন যোগাড়ের কাজ করে তা নয় । সে ঢালাই মিস্ত্রীর মত ঢালাই এর কাজ করতো তাই অনেকে তাকে পুরুষ বলে চিহ্নিত করে দেয় ।

চকোরিকে দেখতে একটু গাট্টাগোট্টা । কৃষ্ণ বর্ণা । শাম্বোষ্ঠী । ঘন কেশ । পিঠ অবধি লুটিয়ে থাকে বেণী । কখনও মোটা খোঁপা বাঁধা তাতে বুনো ফুল লাগানো । চমৎকার লাগে । মানানসই তামা কিংবা পেতলের গহনা । হাঁটু অবধি কাপড় , মেটে টিপ ।

ঘরামির কাজ হয়ে গেলে কাপড়ের মাপ হাঁটু থেকে নেমে পায়ের পাতা অবধি চলে যায় । তখন সে শহুরে যুবতী । যে নজরুলগীতি গায় ।

ওরই মতন বি-এ পাশ যুবক ইতিহাসে পাতিহাস কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অগাধ জ্ঞান নিয়ে আসা হাবিশ তার গলায় মালা দেয় ঘরামি হওয়া সত্ত্বেও । কিন্তু গণধর্ষণ সেই বিবাহের ইতি টানে । হাবিশ আত্মহত্যা করে বসে ।

চকোরি অনেকদিন নাকি দীঘির ধারে একা বসে থাকতো। নাওয়া খাওয়া ভুলে । তারপর ওদের ধর্মীয় পুজো ফুজো করে সুস্থ হয় । আগে যেমন

সাহসী ছিলো ও সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখাবার আগ্রহ ছিলো সেরকম না হলেও ভেঙে পড়েনা একেবারে । স্বামীর মতন লুটিয়েও পড়েনা ।

এখন সে কাজ করে ।

পাখির ব্যবসা করে । পাখি বিকিকিনি করে । এই গ্রামে অনেক ট্রেকার আসে । প্রচুর বাইরের মানুষ আসে । অনেক পাহাড় আছে । ভেষজের ভান্ডার । নানান লোক আসে । গ্রামের নাম আছে । মুণিঋষিদের আশ্রম আছে । তাই ওর পাখিও খুব বিক্রি হয় । জঙ্গলে গিয়ে গাছ কেটে পাখির বাচ্চা বার করে নিয়ে আসে ও, গাছের কান্ডের ভেতর থেকে। বড় বড় গাছ কেটে তার মধ্যে থেকে হাত ঢুকিয়ে টিয়া পাখির বাচ্চা নিয়ে এসে বিক্রি করে । টিয়ার ছানাগুলো ক্যাঁ ক্যাঁ করে । করুণ চোখে চেয়ে থাকে । কিন্তু চকোরি ; যার নিজের নামের অর্থও কোনো পাখি কেমন নির্মম চোখে ওদের দিকে চায় তারপর এক এক করে বার করে এনে বাজারে বিক্রি করে দেয় । কেউ প্রশ্ন করলে বলে , **ওরা তো একদিন উড়ে যাবেই ।কপালে সবার ঘর সয়না । তাই সময় থাকতে আমি ওদের ঘর খুঁজে দিই ।**

যেই সোনার দাঁত নিয়ে এত কান্ড সেই দাঁত কিন্তু ওর স্বামী হাবিশই ওকে গড়ে দিয়েছিলো কারণ ঢালাই মিস্ত্রীর কাজ করতে গিয়ে একবার আঘাত পেয়ে ওর একটি দাঁত পড়ে যায় ও চকোরিকে লোকে ফোক্‌লা বলে ক্ষ্যাপাতে শুরু করে । তখন টাকা জমিয়ে হাবিশ ওকে সোনার দাঁত গড়ে দেয় । সেই সময় হাবিশও তো সরকারি চাকরি করতো ! মিষ্টি করে বলে ওঠে , আরে এই ফোক্‌লা মেয়েটাই তো আমার বৌ রে !!

চতুর্থ ইমেল

হরজাই

হরজাই একজন মহিলা যার বেশ বয়স হয়েছে । এই গ্রামে থাকেন তা অনেক বছর ধরেই । এই গ্রামের একটা দিকের পাথুরে জমিকে উনি ও ওনার শাগরেদ মিলে সুবিশাল বন ও ক্ষেতে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন । **ওনারা বলেন পার্মাকালচার ।**

ব্যাপারটি কি খতিয়ে দেখতে সারেঙ্গী একদিন ওদের খামারে যায় । ভদ্রমহিলার বয়স মোটামুটি তবে উন্মুক্ত যৌবন । স্তন দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে । প্যান্টের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে থপ্‌থপে দুটি পশ্চাৎ দেশ । মাংসল ও পুষ্ট । সবকিছু যেন সাজিয়ে রাখা হয়েছে । কেমন বেমানান লাগে বয়স ও ওনার কাজের গভীরতার সাথে ।

--এসব তো হিন্দী সিনেমায় দেখা যায় , মনে মনে ভাবে সারেঙ্গী । মুখে কিছু বলে না ।

পরিচয় করে বুঝতে পারে এই অশ্লীলতা বাদ দিলে মহিলা খুবই প্রজ্ঞার অধিকারিনী ও রুচিশীলা । এহেন বিদুষী এই গ্রামে কেন জানতে চায় সে এবং জানতেও পারে ।

-আগে ডেনমার্কে থাকতাম । অনেকদিন ছিলাম । ওখানে অ্যাগ্রিকালচার নিয়ে পড়েছি ও কাজ করেছি । কিছুদিন সাউথ অ্যাফ্রিকাতেও ছিলাম । ওখানেই আমার স্বামীর সাথে পরিচয় । আমার থেকে সাত বছরের ছোট । আমি হরজিন্দর সিং আর ও বলবিন্দর সিং ।

-কিন্তু আমি তো শুনেছি আপনার নাম হরজাই । হরজাই সিং ।

-হ্যাঁ , ঠিকই শুনেছেন আমি এখন হরজাই কিন্তু আগে ছিলাম হরজিন্দর । আমি নিজেকে নারীতে রূপান্তরিত করেছি । **কারণ আমি বলবিন্দরকে --ভালোবেসেছিলাম ।** দুজনে একসাথে কাজ করতে করতেই প্রেমে পড়ি । ও আমার থেকে ৭ বছরের ছোট এবং আমারই মতন পুরুষ ! কিন্তু আমাদের মনের মিল এত, বৈদগ্ধ্য ও ওয়েভলেন্থ

মেলে তাই ওকে ভুলে যাবার কথা ভাবতে পারিনি ও যাইওনি । ওর এত সাহস নেই তাই আমিই নিজেকে মেয়ে বানিয়ে ফেলি । আর দেখুন আজ আমরা কোথায় ! গলার স্বর বদলাই । হাঁটাচলা , সাজগোজ সব বদলে ফেলি কেবল ওর জন্য । ডেনমার্কেই বিয়ে করি ।

এই অবধি বলে নিজের নকল নখগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন মহিলা হরজাই যার নামের মানে বেওয়াফা ।

আবার বলে ওঠেন নকল মিহিস্বরে ,

আর হয়ত ওর দেহটা ৭ বছর পরে জন্মেছে কিন্তু আত্মা ? ওর আত্মার বয়স ১০০০০ আর আমার মাত্র ৮০০ তাই না ? গীতা পড়েন নি ? আপনি হিন্দু না ? এখানে এসে পার্মাকাল্চারের সাহায্যে রুক্ষ্ম জমিকে অরণ্য ও চাষের ক্ষেতে পরিণত করি । ডেনমার্কে ভালো চাষ হয় । শিক্ষা সেখানে আধুনিক মানের । এখন কতনা সবজির ফলন হচ্ছে এখানে । সবুজে ভরে উঠেছে এই গ্রাম ।

কতনা লোকের রোজগারের পথ বার হয়েছে । আমরা টাটকা অর্গানিক সবজির প্যান্ট্রি খুলেছি । লোককে সবজি ক্ষেত করতেও ট্রেনিং দিচ্ছি ।

সবই রসায়ন ও নকল জিনিস ছাড়া । আমরা দুজনেই তো পাঞ্জাবী । ছোটথেকেই ক্ষেতি বাড়ি

এসব দেখেছি । আমার বাসায় অর্থনীতি ও কৃষিবিদ্যা এসব নিয়েই লেখাপড়ার চল ছিলো । ট্র্যাক্টর চড়ে আমরা স্কুলে যেতাম । আর বলবিন্দরের বাসায় ছিলো কৃষিবিদ্যা ও ব্যবসা নিয়ে পড়ার ও কাজ করার চল । আমরা একত্রে এসে এই কর্মকান্ড তৈরি করেছি । বহুদিন প্রবাসে কাটিয়ে অনেক কিছু শিখেছি । পার্মাকাল্চার হল প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষেতখামার করা । যাতে সেগুলো অনেক লম্বা সময় ধরে ফলন দেয় । বৃষ্টির জল ধরে সেটা সেচের কাজে লাগানো , বন্যার জল ব্যবহার করা , বৃষ্টিতে পচা ঘাসপাতা সার হিসেবে কাজে লাগানো , বেশি গাছপালা লাগালে আস্তে আস্তে পশুপাখি আসবে যেমন শেঁয়াল , হরিণ , ময়ূর , খরগোশ , মেঠো ইঁদুর , বুনো শূকর , ছাগল ইত্যাদি । এরা আরো সাহায্য করবে জঙ্গলকে বেড়ে উঠতে । **তবে সব গাছ কিন্তু ভালো নয় ।** গাছ লাগান ,গাছ লাগান করে যে অনেকে চিল্লায় সেটা ঠিক নয় । বহু গাছ আছে যেগুলি আমাদের জন্য হিতকারী নয় । **নানান নামীদামী বিষবৃক্ষ আছে এবং তাছাড়াও সুইসাইড ট্রি ,পাইন ট্রি ,সোনাঝুরি ট্রি এরা কিন্তু খুব একটি সুনাম কেনেনি বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতায় । গাছেরও ছিরিছাঁদ আছে ।**

হেঁইও করে ট্রাক বোঝাই করে গাছের চারা ও বীজ নিয়ে লাগাতে বসে গেলাম ও নাম কুড়ালাম অ্যাফরেস্টেশান করছি বলে আর গোটা কয়েক সবুজ সবুজ উপহারও বগলদাবা করলাম এগুলো কোনো কাজের কথা নয়, এগুলো ভাঁওতাবাজি । লোক ঠকানো কাজকারবার । আগে বিদ্যাটা রপ্ত করো , তবে তো গাছ লাগাবে ! চাকু ধরতে না শিখলে মাংস কাটবে কীদৃশ ?

এক নি:শ্বাসে বলে থামলেন, নারী রূপী পুরুষ হরজাই ।

-আহা কী রূপ ! মরে যাই, মরে যাই ! ইয়া ইয়া স্তন আর সুগভীর বিভাজিকা ও থপথপে শিথিল দুই পাছায়, পাছা পেড়ে নাতিদীর্ঘ স্কার্ট । স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্রাউজ , ব্লাউজ নয় । যেন ভুলে না যায় কেউ যে উনি আদতে নারী নন । চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন এই বিদুষী নারী হরজাই ।

নিজেই মোটরবাইকে করে বাজার করে আনেন ।
ব্যাঙ্কে যান । বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে যান ।

ভদ্রমহিলার পোষা একটি শেঁয়াল আছে । ওনার তৈরি অরণ্যে হুক্কা হুয়ারা এসেছিলো তাদের কারো বাচ্চা হবে এটি । নাম গড্জিলা ।

মোটা ল্যাজ , সোনালী রং আর ধারালো আঁখি তার । মনে হয় হাজার বছর ধরে চেয়ে আছে এই শৃগাল শাবক কোন সে রবিনসন ক্রুজোর সন্ধানে !

মহিলার ম্যান ফ্রাইডে অর্থাৎ বলবিন্দর তুলনায় শান্ত মানুষ । কাজ ফুরালেই মদে ডুবে যান ।

হাইট কম । শুধু বয়সেই কম নন বৌয়ের চেয়ে হাইটেও কম । তবে ঐ বৌয়ের ল্যাজ ধরে ঘোরা টাইপের মানুষ । মিতভাষী । প্রচুর মদ খান।

বলে সেই উত্তম কুমারের সিনেমার মতন , কোনটা? ভুলে গেছি , আমায় আরো মদ দাও - সেরকম , ম্যান ফ্রাইডে বহুৎ মদ্যপান করেন ।

মদ খান আবার যকৃৎ ভালো রাখার জন্য মিল্ক থিসেল ও কালমেঘ খান । বলেন , সবই প্রকৃতি আমাদের হাতে দিয়েছে । শুধু নলেজটা দরকার আর ব্যালেন্সটা । তাহলেই মানুষ সুস্থভাবে দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে । নলেজ ইজ্ পাওয়ার ।

বিজ্ঞানীর কাছেই জানা যায় যে গাছ কথা বলে ও কলোনি করে থাকে । ব্যাথা বেদনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করে ও সাবধান করে অন্যকে । ওদেরও সেন্সেশান আছে বলে ওরাই কাঁদে ও পরস্পরকে সতর্ক করে ওদের সামাজিক দায়িত্ব

পালন করে থাকে । **বলে আবার মদে ডুবে যান বলবিন্দর সিং ।**

পতিপরমেশ্বর মদিরায় আচ্ছন্ন হলেও সতী হরজাই ততক্ষণে একটি সৎ কাজে নিযুক্ত হয়েছেন । প্রায়ই উনি রক্তদান করে থাকেন । কারণ একজন লোক রক্ত দিলে তার থেকে তিনজন মানুষ জীবন ফিরে পেতে সক্ষম । ওনার বক্তব্য অবশ্যি হল , কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইগনোরেন্স ইজ্ ব্লিস অবশ্যই ; কারণ সবাই সবকিছু জানতে আরম্ভ করলে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে কারণ সবাইকে সবকিছু সঠিকভাবে ও মাত্রায় বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বা অধিকার প্রকৃতি দেয়নি । উপযুক্ত লোকের হাতে না পড়লে পরম জ্ঞানও চরম আকার ধারণ করতে পারে ও মানুষ খামোখা বীভৎসতার শিকার হতে পারে । এই দেখোনা ওরা যদি জানতে পারে আমি পুরুষ , তাহলে কি আর আমাকে এত ইজ্জৎ দেবে ? এই গেঁয়ো গরীবগুর্বো মানুষগুলো ? যারা এখন আমাকে দেবীর আসনে বসিয়ে রেখেছে ওদের জীবনধারণের ধারা বদলে দিয়েছি বলে ?

হা হা হা করে বিকট শব্দে হেসে ওঠেন হরজাই ।

হাসিটা কোনো চেনাছকের মানবীর হাসি বলে আদৌ মনে হয়না সারেঙ্গীর ।

পঞ্চম ইমেল

কপিলা

কপিলা একজন ডোম । মহিলা ডোম । তার স্বামী মারা যাবার পরে সে এই কাজে নামে পরিবারকে লালন পালন করার জন্য । এই গ্রাম রাজামুদ্রায় বাস করে তিন তিনটে সন্তান নিয়ে । সে চায়না তার সন্তানেরা ডোম হয় । তারা পড়ে । সরকারি স্কুলে ।

সবচেয়ে বড় ছেলে ড্রাইভার হতে চায় কিন্তু কোনো মোটর গাড়ির চালক তাকে গাড়ি চালাতে শেখায় নি সে ডোমের সন্তান বলে । তার বাবা ও এখন মা সারাদিন মড়া পোড়ায় ।

তা সে যাইহোক কপিলার এখন মাঝ বয়স । কপালে কুঞ্চন । হলদে রং । চোখা নাসিকা । চোখদুখানি বড় মায়াবী । মুখটা সুন্দর ।

আচ্ছা ডোমের ঘরের বৌ যদি মুভি স্টারের মতন দেখতে হয় তাহলে কেমন হয় ? কপিলাকে মধুবালার মতন দেখতে । ধীর স্থির ।

মড়া পোড়ানোর কালো ধোঁয়া তার গাত্রবর্ণকে কালো করতে পারেনি ।

চলাফেরায় ছন্দ আছে । মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে । ওর একটি মেয়ে আছে । সে স্কুলে পড়ে । মায়ের মতন রূপসী । নাম কদম । বয়স আন্দাজ ১৩/১৪ হবে । সে অবসরে বাগান করে । নানান ফুল ফোটায় । শ্মাশানে ফুলের চাষ করে করে একে একটা পার্কের মতন করে ফেলেছে । আর এটা সরকারি দাহ করার ক্ষেত্র । তাই সরকার থেকে চড়া রং করে এমন একটা আলাদা ঔজ্জ্বল্য এসেছে যে মনেই হয়না এটা দু:খের স্থল ।

মৃত্যু যদিও কষ্টের তবুও যেন একটু উজ্জ্বলতার আবেশ লেগে আছে এখানে । মনে হয় যেন এখান থেকে প্রতিটি আত্মাই স্বর্গে যায় ।

এমনই পুষ্প রচনা হয়েছে এই শ্মশানে । শিউলি ,

বেল, জবা, টগর, রঙ্গন , চাঁপা , যুঁই , পদ্ম , দোপাটি , নয়নতারা , হলুদগাঁদা , গোলাপ কি নেই ? কদম ও তার মা মড়া পোড়ানোর অবকাশে

এইসব ছাইপাশ করে থাকে । কপিলা প্রতি মড়া পিছু ৩০০ টাকা পায় । দিনে প্রায় ৩০/৪০ টা মড়া আসে কারণ এটা জংশন শ্মশান । আশেপাশের গ্রাম থেকে মড়া আসে । কমবেশী হয় ।

এছাড়াও মৃতদের পরিবারের লোকেরা হয়ত এক্সট্রা কিছু দেয় ।

--আগে গা গুলিয়ে উঠতো পচা গন্ধে , মানুষের মাংস পোড়া গন্ধে কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গেছে । মৃদু স্বরে বলে ওঠে কপিলা ।

কথা শুনে হেসে ওঠে কদম ।

দুজনের মাথায় ফুল গোঁজা । হাতে কাঁচের চুড়ি ।

ডোমদের কোনো এক পূর্বজকে নাকি মহাদেব শাপ দেন পার্বতীর অলংকার চুরি করার জন্য যে তারা মৃতদেহ দাহ কার্যে নিযুক্ত হবে । গল্প না সত্য জানা নেই । কপিলা নিজেও জানেনা । তবে মহাদেবের ভক্ত । শিবরাত্রি পালন করে । চায় কদমের শিবের মতন বর হোক্ ।

শ্মশানে রাতে মাতালের আড্ডা বসে । তখন ওদের বাসায় অনেকে হানা দেয় । ওদের বাসা পাশেই । তবে দুই ছেলে আছে । তারা যন্ডা গুন্ডা ধরণের ।

লাঠি নিয়ে মা ও সহোদরাকে পাহারা দিয়ে থাকে ।

ওরা ডোম হবেনা । একজন শহরে চলে যাবে কাজের খোঁজে ঠিক করেছে আর অন্যজন এখানে শ্মশানের সাথে যুক্ত কোনো সরকারি কাজ নেবে বলে স্থির করেছে । সেইমত এক মাতব্বরের সাথে কথাও বলেছে ওর মা ।

সেই মাতব্বর আবার শ্মশানের পুরোহিত । ব্রাহ্মণ ।

তার সংসার আছে । লোকটি বুড়ো । মড়ার সৎকার করার সময় পুজো টুজো করে । লোকে বলে কপিলার রূপে মজেছে । তা প্রেম কি আর জাতপাত , বয়স দেখে ?

তবে পুরুৎ মশাই বিপত্নীক । কাজেই চারটে সন্তানের পিতা হলেও কেউ কিছু বলেনা । ছেলেপুলেরা কেজো । মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গেছে । লোকটি খুব দাপুটে । পয়সাও ভালো আছে ।

তবে অশ্লীল কিছু কেউ বলেনা । ঐ একটু রসের কথা আর কি ! গোলাপ জাম , রসমালাই , মিহিদানা অবধিই সীমাবদ্ধ ।

কপিলার স্বামী জীবিত থাকতেই তো সে মড়া পোড়ানো দেখে এসেছে । তারও আগে বাপের ঘরে

কাজেই এসব নতুন নয় তার কাছে । কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে ঘুরতো । যে কেন মানুষ মানুষকে এত ছোট করে ? কে কবে মরবে কেউ কি জানে ? আর মরে গেলেই তো সব শেষ !

পরে নিজে মড়া পোড়াতে গিয়ে নানান অভিজ্ঞতা হয়েছে । মৃতর আত্মা পেছন পেছন বাসায় এসে হাজির হয়েছে । বিরক্ত করেছে । ঘর ওলট পালট করে দিয়েছে । ধুম্ জ্বর । একবার ওর ছোট ছেলে মরতে মরতে বেঁচে গেছে । কত কি হয়েছে তার সাথে ! একধরণের মানুষ দেখেছে যার দুটো মাথা ! আদতে চিকিৎসক বলেছে একটা মাথা আর একটা মাথার মতন দেখতে অবিকল একটা টিউমার বা আব । আবার এমনও দেখেছে যে বুড়োকে পোড়াতে নিয়ে এসেছে । অথচ বুড়ো হঠাৎ জীবিতর মতন লাফিয়ে চিতার ওপরে উঠে বসেছে । আজকাল ইউটিউব হয়েছে । মোবাইলে দেখা যায় । সেখান থেকে লোকে ওর সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছে । একই কথা বার বার বলে গলা ধরে গেছে । কেউ কেউ টাকা দিয়েছে । কেউ ওর মেয়েকে ও তাকে শাড়ি কিনে দিয়ে গেছে ।

শ্মাশানে মৃতর চেয়ে আজকাল জ্যান্ত লোকই বেশি এসেছে ওর সাক্ষাৎকার নিতে । ডোম একজন মহিলা এটাই নাকি চমৎকার জিনিস একটা ।

মেয়েরা নাকি শ্মশানে যায়না । কান্নাকাটি করে তাই । ওরা নরম মনের লোক । কিন্তু কপিলা ইদানিং অনেক নব্যযুগের মহিলাকে শ্মশানে আসতে দেখেছে । তারা শক্ত পোক্ত । মোবাইলে পটাপট মড়ার ছবি নিচ্ছে আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছেও না ।

আজকাল লোকে অত কাঁদে না । মতলবে চলে সবাই । মতলব থাকলে ; মানুষ না মরলেও লোকে কেঁদে ফেলে ।

কপিলা জানে মড়া পোড়ানো হয়ে গেলে একবছর অবধি আত্মা পরিবারের কাছেই থাকে । তারপরে দৈব আদেশে তাকে পিতৃলোক এ চলে যেতে হয় ।

এহেন কপিলা একটি চমৎকার কাজ করে ফেলে কোভিডের সময় । এই মহামারির সময় এত মানুষের দেহ আসে যে শ্মাশান প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে । আর এটা এক ধরণের মহাশ্মশান বলা চলে এই এলাকার । এত মানুষের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত রাজামুদ্রা ও তার পাশের গ্রামের লোকেরা যখন তাদের প্রিয়জনদের দেহ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলো

শ্মশানের আশেপাশের জঙ্গলে ও খাদে তখন কপিলা নিজের হাতে তার সাজানো বাগান থেকে ফুল তুলে তুলে প্রতিটি দেহের সাথে সেঁটে দেয় । কদমকে নিয়ে এই মহাযজ্ঞ চলে তার সারাটা সময় ।যতক্ষণ তার শরীরে দেয় । **শ্মশানের** বাগান থেকে এক মুঠো শিউলি , যুঁই , চাঁপা যাইহোক না কেন সে গেঁথে দিচ্ছে প্রতিটি মৃতদেহের সাথে আর মুখে বলছে , **সৎকার করার জায়গা নেই , উপায় নেই বলে ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছো গহীন বনে, খাদে কিন্তু একটু ফুলে চুবিয়ে ফেলে দিও । একটু শান্তি পাক ওরা ! নাই বা পেলো চন্দন ,তেল, সিন্দুর ! রোদ এত তেঁতে আছে তবু সবার কপালে আগুন জোটেনা দেখছি ! মুঠো মুঠো ফুল দিই । তবে তাই হোক্ ।**

ষষ্ঠ ইমেল

সরলা

সব শেষ চরিত্র সরলা । এর আসল নাম রেখা কামিনে । মারাঠি ব্রাহ্মণ । বিয়ের পরে হয় রেখা গজানন । যতদূর জানা যায় না এর নাম আসল না এর জন্মস্থান এই এলাকায় । এরা সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলো কোনো এক সময় । বলে নাকি এদের পূর্বপুরুষ রাজা ছিলো সেখানে , কোনো বীরপুরুষের আত্মীয় । কিন্তু পরে জানা যায় যে এরা আদতে ডাকাতের পরিবার । হারেরেরে করে এদের পূর্বজরা সব লুটেপুটে নিয়ে কোনো গ্রামে রাজত্ব শুরু করে । পরে আরো গ্রামে গিয়ে মোড়লদের মেরে ধরে দখল নেয় । এইভাবে রাজত্ব বড় করে । পরে পুলিশের তাড়া খেয়ে এই রাজ্যে এসে ঘাঁটি গাড়ে । মহিলার বর ছিলো সাধারণ পরিবারের ছেলে । তার বাপ্ সরকারি কাজ করতো , ডাক পিওন । চারটে ভাইবোন । অভাবের সংসার । কিন্তু

লোকটির লোভ বড্ড বেশি তাই স্কুলের সময় থেকে বন্ধুদের টিফিন , জুতো , পেন, পেন্সিল দিয়ে শুরু হয় চৌর্য্য বৃত্তির জীবন । এরপরে বড় দাঁও মারতে আরম্ভ করে । তবে মস্তিষ্ক ছিলো পরিষ্কার । মেধাবীও বটে । অংকে ও বিজ্ঞানে অনেক নম্বর পেতো । খেলাধুলায় চ্যাম্পিয়ান । দেখতেও সুদর্শন । ডান গালে কালো রং এর একটা বড় জড়ুল ; চেহারাকে আকর্ষনীয় করে ।

খুব ফর্সা রং ও পেটানো চেহারা । আগের জন্মে হয়ত সত্যি রাজা টাজা ছিলো । মোটা গোঁফ । বলিষ্ঠ । জংলী ঘোড়াকে কাবু করতে সক্ষম ।

ডান হাতে হয়ত চুরি করেই আনা একটা সোনার মোটা বাজুবন্দ বা তাগা সব সময় পরে থাকতো ।

তাতে লোকটির হাতটা বেজায় সুন্দর দেখাতো ।

লোকটির নারীলোলুপতার গল্প শুনলে আর রাতে ঘুম হবেনা । এত সুবিশাল সেই গল্পের ভান্ডার ।

এই লাম্পট্যের জন্যই কিনা জানা নেই তার পত্নী সরলা তাকে হত্যা করে বসে । তখনই সব সত্য বাইরে আসে এক এক করে ।

এই মানুষটিকে নাকি সরলাই অর্থাৎ রেখা কামিনেই তুকতাক করে বাগায় , পতি রূপে ।

লোকটি মহারাষ্ট্রে একটি লোকাল রাজনৈতিক দল **রাম রহিম গেট আউট** এর সদস্য ছিলো কৈশোর থেকে । এরা কমিউনিস্ট নয় তবে নাস্তিক ।

লজিক্যাল পার্টি । লজিক দিয়ে সব বিচার করে ।

মহাবিশ্ব স্বয়ম্ভূ , মহাশূন্যতা থেকে সব এসেছে । কেউ কারো ভোগান্তির জন্য দায়ী নয় সবই কজ অ্যান্ড এফেক্টের ব্যাপার এসব প্রচার করে ।

যতখুশী লোককে টর্চার করো ও পরে কিছু শক্তি ওখানে পাচার করে দিলেই সব সেটেল হয়ে গেলো এই মতবাদে বিশ্বাসী ওরা এবং এসবের বৈজ্ঞানিক প্রমাণও দিতে চায় ও পারে চিত্র এঁকে এঁকে । এর জন্য জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি ও রাজনীশের মতন **দার্শনিকের** প্রচারিত তথ্যকে কাজে লাগায় ।

এবং বলাবাহুল্য গড কমপ্লেক্সে ভোগে ও নার্সিসিস্ট । সুন্দর চেহারা ও বক্তৃতা দিতে সক্ষম দেখে তার দল তাকেই আগে রাখতো । ধীরে ধীরে টিভিতে মুখ দেখাতে থাকে ও জনপ্রিয় হয় । এবং ডাকাতে পরিবারের মেয়ে রেখার নজর কাড়ে । শুরু হয় তুকতাকের খেলা । লোকটি ভাবে এই বর্ধিষ্ণু

পরিবারে ঢুকে গেলে কেল্লা ফতে আর রেখা ভাবে যে একে একবার ফাঁসাতে পারলে ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে যাবে তাই দুজনে একদিন মন দেওয়া নেওয়া সেরে ফেলে। **দিলের ডীল হয় এক চাঁদনি রাতে।**

রেখার বিয়ে হওয়া মুসকিল ছিলো বলে শোনা যায়। কারণ অসম্ভব কুশ্রী ছিলো সে।

দাঁত উঁচু , ট্যারা , কুতকুতে আঁখি , খ্যাদা নাসিকা , বেঁটে- কেঁদে কঁকিয়ে ৪ ফিট ১০ ইঞ্চি হবে আর সারা দেহে শ্বেতী- বলে সাদা ধবধবে রং দেখলে চট করে মেমসাহেব মনে হতে পারে। মাথায় কুঞ্চিত কেশ। তা চুলের পরিমান ভালই ছিলো। কোমড় অবধি। তবে নিন্দুকে বলতো - তা হাইট তো এক সেন্টিমিটার কাজেই চুল আর কতটা লম্বা লাগে কোমড় ছুঁতে ?

সেই চুলকেই নানানভাবে বেঁধে স্টাইল করতো এই সাজুনি। সাজগোজ করেই লোক পটাতো যে।

বোঁচা নাকে নথ , চুলে টিকলি এসব পরে সাজতো। তবে ওর বরকে আকর্ষণ করতে এসব কিছুই লাগেনি। সে কেবল অর্থ ও প্রতিপত্তি দেখেই তার দিকে ধাবিত হয়।

ডাকাতে পরিবার হোক্ আর যাইহোক্ টাকাপয়সা ও পাওয়ার ছিলো গ্রামেগঞ্জে আর নামও ছিলো জমিদার হিসেবে তাই লোকাল পার্টি থেকে রাজ্য স্তরে চলে এলো রেখার স্বামী আমোদ গজানন খুব শীঘ্রই । আর রেখা--গজানন মানে মিসেস গজানন হয়ে গেলো কামিনে থেকে । এখন সে সরলা কামিনে নয়। এর নাম মাধুর্য্য মন্ডিত । সরলা সে নয়- জটিলা । আবার কামিনেই তার আসল পরিচয় দেয় । কাজেই নামাবলী যে তাকে পরিয়েছে সে সর্বজ্ঞ ।

রেখা গজানন , সরলা কামিনে, রেখা কামিনে অদ্ভুত এক বর্ণের মিলন ! ছন্দোবদ্ধ কবিতার মতন কিন্তু এই কবিতা মানুষকে মধুরতা দেয়না , মনে বিষসঞ্চার করে ।

অনেকগুলি শয়তান মহিলাকে যদি একসঙ্গে বেঁধে তাদের ডিএনএ নিয়ে একটি মহানায়িকা গঠন করা হয় তাহলে রেখা গজানন হবে সেই মহানায়িকা ।

এত হতশ্রী ও কুৎসিত মনের নারী ইতিহাসেও ছিলো কিনা সন্দেহ ।

কুব্জা মন্থরা , সূর্পনখা , পূতনা , হোলিকা , তাড়কা সব এক সাথে হল রেখা ।

আমোদ গজাননের সাথে বিয়ের তিন বছর পর এর প্রথম সন্তান জন্মায় যা আদতে জারজ । এই সন্তানের পিতা ওদের ডাকাত সমাজের কেউ যার আধিপত্যের সুধা ওদের প্রয়োজন ছিলো তাই তার সাথে রং মিলন্তি খেলতে খেলতে একদিন মা হয়ে যায় রেখা । আর আজব কান্ড হল আমোদ সেই সন্তানকে রেখে দেয় । চুপটি করে । কোনো ঝামেলাও করেনা । কারণ কখন এই মোহর বা তুরূপের তাস কি কাজে লেগে যায় !!

কেশ ব্যাতীত রেখার আর একটি গুণ ছিলো ।

ডাকাতে কালীর সে ছিলো একনিষ্ঠ ভক্ত ।

তাই তন্ত্র মন্ত্র ভালো জানতো । বশীকরণ , মারণ উচাটন এসব এবং পরবর্ত্তীতে রাজামুদ্রা গ্রামে নানান বিদেশী ও অ্যাফ্রিকানের আনাগোনা বাড়তে ভূ ডু, সান্তারিয়া ও অন্যান্য লাতিন আমেরিকান তুকতাক বিদ্যা এসবেও সে পটিয়সী হয়ে ওঠে । এবং অফিসিয়ালি একজন গৃহবধূ হলেও সে আদতে এগুলো বেশ চড়া দামে লোকের মধ্যে প্রচার করতো ও কাজ করতো এগুলো নিয়ে ।

স্বামীর লাম্পট্যে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে খুন করে তুকতাক করে । স্বামী লোকাল মোড়ল ছিলো ।

এই গ্রামে এসে সম্পদ বলে আন অফিসিয়াল মাতব্বর হয়ে বসে । তবে লোকটির একটি গুণ ছিলো যে কেউ ওকে না ঘাঁটালে ও বিশেষ সমস্যা করতো না । পতি ও পত্নী দুজনেই দুজনকে সন্দেহ করতো । কিন্তু লোকটি তার বৌকে ছেড়ে যেতে অক্ষম ছিলো কারণ সে তুকতাক করে তাকে আটকে রাখে বলে শোনা যায় ।

মহিলাটি তার বিশাল প্রাসাদের বাইরে যেতোনা ।

তাই নিজেকে আনপড় গৃহবধূ বলে দেয়-যখন পুলিশ তাকে ধরে । কিন্তু সত্য হল এই যে সে তার সারাদেহে শ্বেতীর কারণে লজ্জায় বাইরে যেতো না ।

লোক মুখে শোনা যায় যে তার তিনটি সন্তানের মধ্যে দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে । প্রথমটি তো জারজ , দ্বিতীয়টি ওর স্বামীর মেয়ে এবং ছোট মেয়েটি নাকি তার পিতার অর্থাৎ রেখা গজাননের পিতার ঔরসে সৃষ্ট সন্তান । এগুলো লোকে বলে ।

সেই মেয়ে অবশ্যি জীবিত নেই । তাকে এই সরলা রমণীই নিজ হস্তে ফিনিশ করেছে ।

কারণ সেই মেয়েটির জন্ম ইতিহাস যতই কদর্য হোক্ না কেন সে এইসব কালাজাদু ফাদুর প্রতিবাদ করেছিলো ও এসব করে মানুষকে কন্ট্রোল করা ,

তাদের জীবন নিয়ে খেলা করা , খুন করা এগুলো যে কোনো সুস্থ জিনিস নয় ও চালিয়ে যেতে পারেনা কেউ সেসব ওদের বলে ছিলো । বেফাঁস কথা বলে ফেলায় রেখা গজানন নিজের হাতে নিজ মেয়েকে খুন করে লাশ ফেলে দেয় জঙ্গলে ।

জংলী জানোয়ারের বনভোজনের জন্য ।

মেয়েটির নাম ছিলো পূজা । পূর্ণিমা ও পূজা , দুই মেয়ে তার । পূজাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে , মুখে টেপ আটকে পেছন দিকে থেকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজ হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় তার মা রাক্ষসী রেখা গজানন । আর সেসব দ্যাখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা ও তার দাদা , জারজ রাতুল । যার কোনো সারনেম নেই । পথচারী সারমেয়ের মতন । অনাদৃত , অবহেলিত ।

আজও নাকি পূজার প্রেতাআ এই মহলের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় । লোকে দেখেছে । বীভৎস চীৎকার করে ছুটে যায় জলের উৎসের দিকে ।

সারা গায়ে আগুন জ্বলছে । কিন্তু কারো ক্ষতি করেনা এই প্রেতাআ ।

রেখা গজানন যাকে ইদানিং লোকে শর্টে মানে এস-এম-এসের যুগে আর-জি বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছে সে নাকি বাসায় উলঙ্গ হয়ে থাকে । অর্থাৎ বক্ষ অনাবৃত ও নিচে একফালি কাপড় জড়ানো থাকে । লোকে বলে ওর নাকি শ্বেতীর জন্য সারা গা চুলকায় । কিন্তু নিন্দুকে বলে যে এই বয়সেও সে যৌন লালসায় ভোগে । তাই মহলের চাকর বাকর ও গাড়োয়ান , পালোয়ান কাউকেই ছাড়েনা । তারাও কেউ কেউ রাজি হয়ে যায় কারণ এই কলি যুগে ভালো বকশিস্ মেলে । রেখার এটাও আরেকটা গুণ বটে ! হাত বেশ খোলা । ওকে শয্যায় স্যাটিসফাই করলে মুক্ত হস্তে দান করে ।এমনও শোনা যায় যে পতি পরমেশ্বর বহুদিন বাদে মহলে ফিরেছেন আর তাকে যত্ন আত্তি না করে বিবি তার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে উপপতি নিয়ে অন্য ঘরে কামের কামর খেয়ে নিশি যাপন করছেন । রেখা গজানন বা আর-জির বয়স তখন ষাট ছুঁই ছুঁই - বালাই সাট এমনও হয় নাকি ? **টাকাপয়সা থাকলে সব সম্ভব । চেপে দিলেই হল !!**

ইলন মাস্ক বলেছে না শোনেন নি ? আমার পাওয়ার আছে তাই মেয়েরা আমার কাছে আসে কারণ আমি এসব হ্যান্ডেল করতে পারি সেরকম রেখার শক্তি আছে , প্রতিপত্তি আছে , বশীকরণ বিদ্যা জানে , একসাথে ১০০ জনকে বিছানায় নিয়ে শুতে গেলে কখন কাকে ব্লো জব্ দিতে হবে আবার মাউথ ওয়াশ মুখে দিয়ে নিয়ে কিসিং করতে হবে এসব তো শিখতে হবে তবেই তো ঠা ঠা ঠা ঠা ঠা ! তাই না ? বন্দুকের মধ্যে কটা গুলি থাকে এগুলি তো জানতে হবে তবেই তো সেলেব শিকার হবে - আজকাল বিশেষ কেউকেটা হতে পারবে । নিজের কাজ না করে ম্যানিপুলেশান যত শিখবে ততই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবে নাহলে আর হলটা কি জীবনে ? **পেতিভা** দিয়েই যদি সব সমীকরণ কষা যেতো তাহলে রেখা গজাননের মতন মুখোশধারী বেশ্যা গুলো পেট ভরাতো কি করে ?

ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেনা , নিখাদ ভালোমানুষের মতন চেহারা , ইন্দ্রজালের মতন তুখোর তন্ত্র মন্ত্রজাল বিস্তার করে মানুষকে সম্মোহন করতে ও তাদের ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত ও অভিনয় করে , মিথ্যা কথা বলে , লোকের ঘরে সিঁধ

কেটে সর্বনাশ করতে বোধহয় এর থেকে বেশি আর কেউ পারেনা ।শোনা যায় প্রেতসাধনা করে লোকের কলঘরে ও ল্যাট্রিনে আত্মা চালান করে তাদের অত্যন্ত ব্যাক্তিগত খবর সংগ্রহ করে এই মহিলা ও তা বাজারে চালান করার হুমকি দিয়ে টাকা কামায় । ব্ল্যাক মেল । বৃদ্ধ মানুষের নামে জীবন বিমা করিয়ে তুকতাক করিয়ে তাদের প্রমাণ ছাড়া মেরে টাকা লোপাট করে দেয় ।

প্রতিটি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা রাতে ও চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণে এই অতীব সরলা নারী ভীষণ আকার ধারণ করে পূতনা রাক্ষসী হয়ে বালগোপালদের নিজ বিষাক্ত দুধ গেলাতে ব্রতী হয় কিন্তু ভুলে গিয়েছিলো সবাই আমোদ গজাননের মতন লোভী পতঙ্গ নয় যে তার আগুনে পুড়ে যাবে ।

বহ্নি পতঙ্গ । হা হা হা । মনে মনে হেসে ওঠে সারেঙ্গী ।

তাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় একদিন । রিটায়ার্ড আই-বি অফিসারের কন্যা রশ্মি বসুর হাতে । যার বাবা মেয়ে হয়েছে বলে ভেঙে পড়েন নি । বরং বলেন **আমি ওকেই ইন্টেলিজেন্স অফিসার বানাবো । হাউজ ওয়াইফ নয় ।**

এই ব্যাপারটি সারেঙ্গীর খুবই ভালো লেগেছে ।

মেয়ে হলেই তাকে নাচ গান আর আঁকা শিখতে হবে কেন ? কেনই বা মডেলিং ?এসব অনেক হয়েছে । মেয়েরা আরো চ্যালেঞ্জিং পেশায় আসুক । যেমন সাবমেরিন চালনা ও ডিজাইন , মিলিটারি কমান্ডার , প্লেন চালনা , হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং সেক্টরে সি-ই-ও , যুদ্ধের সাংবাদিক ,আন্ডারকভারএজেন্ট, মহাকাশচারী, জ্যোতিষ শাস্ত্র বিদ্ , নিউক্লিয়ার প্রফেশনাল ইত্যাদি বলেন সেই আই বি অফিসার ।

রশ্মির ছদ্মনাম ছিলো দুলারি । এই নামেই সে রেখার মহলে ঝিয়ের কাজ নিয়েছিলো । বাসন মাজা থেকে রসুই ঘরের কাজ অনেক কিছুই করতো । **সে আদতে সি বি আইতে নিযুক্ত ।** তার বাবা খুবই তুখোড় অফিসার ছিলেন । এখন আর বেঁচে নেই উনি । রশ্মি, এই মহিলাকে ধরার জন্য নিজ সংসার ছেড়ে একজন কাজের মাসী সেজে রেখা গজাননের মহলে পাক্কা ৬ বছর কাজ করেছে । দেখেছে কি উপায়ে সে তুকতাক করে মানুষ মারে , ধর্ষিত হয় পুরুষেরা ও নারীরা তার মহলে , অত্যাচারিত হয় আর কেউ প্রতিবাদ করলে কুৎসা রটিয়ে দেওয়া হয় তার নামে, পাগল সাজিয়ে দেওয়া হয় অথচ কেউ টিকিটি ধরতে পারেনা কারণ সবই করা হয়

তন্ত্রমতে । কাজেই এই পার্থিব জগতে কোনো প্রমাণ থাকে না তার । মুখ দিয়ে রক্ত উঠে হঠাৎ লোক মরে যায় , বিশ্বস্ত কর্মী হঠাৎ যৌন নিপীড়নের অপবাদে ফাঁসিয়ে দেয় । সুস্থ মানুষ হঠাৎই উন্মাদ হয়ে যায় আর এসব করে আড়ালে বসে সরলা গজানন ওরফে রেখা গজানন কিংবা রেখা কামিনে ।

একে নিয়ে রশ্মির এক চটুল বাঙালী বন্ধু যে কবিতা লেখে তার নাম সুকল্যাণ মজুমদার সে রচনা করে,

ঠ্যাং ফাঁক করে বসে

রেখা যোনিতে আঙুল ঘষে

নিশি রাতে দেয় সিঁধ কাঠি

শয়তান ধরে বড় লাঠি

তারপর এক এক করে ভাঙে সরকার

ওটাই রেখার দরকার

তার চাই পাওয়ার আর মানি

তাই শানায় ট্র্যাপ হানি

নিচে নামতে নামতে সাক্ষাৎ পেত্নীর শালি

দেখলে যারে মুখ দিয়ে বার হয় গালি

শ্বেতী বুড়ি লিখে চলে কেবল পর্ণোগ্রাফি

পেতেছে ফাঁদ ধরবে বলে হিমেশ বা মহম্মদ রফি ।

রশ্মি অবশ্যি বলছিলো যে রেখা গজানন পরে বলেছে তার আইনজ্ঞকে যে গত ছয় জন্ম ধরে নাকি তার এই স্বামীটি তাকে এই একইভাবে জ্বালাচ্ছে । পরকিয়া করে । শয়তানি করে । ও যে কি বাজে লোক তা মুখে বলা যায়না । অথচ রেখা মহাজন তাকে গভীর ভাবে ভালোবেসেছিলো । কিন্তু তার লাম্পট্য ও নিষ্ঠুরতা মহিলাকে অত্যন্ত একা করে দেয় । কিন্তু সে হারতে রাজি নয় । তাই দূর্বল নারী বলে মাথা নত করে সব মেনে নেবে এইরকম না করে মা কালীর রূপার খড়্গ হাতে নিয়ে প্রতিশোধ তোলে । মায়ের নাম করেই তন্ত্র মন্ত্র করে করে জন্ম জন্মাতরের কুকর্মের হিসেব নিকেষ করে ও তাকে শেষ মেষ মৃত্যু পথে ঠেলে দেয় ।এবং বলে যে স্বয়ং মা কালী তো কত অসুর মেরেছেন । আমিও একে অসুরই মনে করি । যে ঘরে বৌ থাকতে অজস্র মেয়ের ইজ্জৎ লোটে আর বৌকে

ঠ্যাঙায় কেবল সে অবলা নারী বলে- আর কেবল মাত্র শয্যাসঙ্গিনী রূপে চিহ্নিত করে রেখে দেয় ; তার মধ্যে যে একটা প্রাণ আছে সেটার গুরুত্ব দেয়না তাকে আমি জন্মজন্মান্তর ধরে এইভাবেই সাজা দিয়ে থাকি ।

পাগলের পাগলামী বেশি হয় পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় আর গ্রহণের সময় কারণ সেগুলো হল তুকতাকের সময় । আঁকি বুকি কেটে , লক্ষ্যের চিত্র এঁকে তাতে আলতা ও সিন্দুর লেপে অথবা ছাগল কিংবা মেষের রক্ত দিয়ে কখনো নিজের হাতের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিয়ে শুরু হয় মন্ত্র জপ । বার বার সেই মানুষের নাম বলে বলে তার চেতনাকে উজ্জীবিত করে তার শক্তিতে ঋণাত্মক সমস্ত চিন্তা ও আকাঙ্খা ভরে দেওয়া হয় । কখনও বা মানুষের বাচ্চাকে বলি দিয়ে, তার কাটা মুন্ডু নিয়ে ক্রিয়াকর্ম করা হয় । **নরবলি চলে দিনের পর দিন এই সরলা গৃহবধূর মহলে । এত মানুষ আসে কোথার থেকে ?**

চাকরদের ধর্ষণের ব্যবস্থা আছে । তাতে মেয়েরা পোয়াতি হয় । তারপর সেইসব শিশুদের বলি দেওয়া হয় হাঁড়িকাঠে । আশেপাশের গ্রামের কোমল মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে এসব করা হয় ।

এদের গ্যাং আছে যারা গ্রামীন সমাজেই সুস্থ সবল মানুষ সেজে থাকে । কখনও সুদের কারবারি , কখনও বয়ফ্রেন্ড আবার কখনও কখনও উপকারি

মুখোশধারী পড়শি । রেখা গজানন মহলের বাইরে আসেনা । অর্ধ নগ্ন হয়ে বাসায় থাকে ।

মদ্যপানে ও আফিং নিতে অভ্যস্ত । চড়ে গেলে সোমত্ত যুবক লাগে । নাহলে মাথা ফেটে যায় ।

দেখা গেছে এই বয়স্ক মহিলা ; উঁচু পাঁচিল ঘেরা মহলের অন্দরে পড়ে থাকা আবর্জনা থেকে কুড়িয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খায় । কুকুরের বিষ্ঠাও ভক্ষণ করে । এতেই বোঝা যায় শয়তানের ছায়া আছে তার ওপরে । এই বয়সেও পিরিয়ড হবার জন্য শিকর বাকর খায় । আর ওর স্বামী লোকাল মাতব্বর । খুবই বিনয়ী ও শিক্ষিত । লজিক্যাল । বিজ্ঞান শিক্ষায় আলোকিত । তাকে দেখে কেউ বোঝেনা যে তারা এইসব কুসংস্কারে বিশ্বাসী । কথায় কথায় সায়েন্স এর তরবারি আর র‍্যাশন্যালিটির খঞ্জর শানায় আমোদ গজানন । কাজেই কেল্লা ফতে !

ভ্রমরের মধু খাওয়ায় বাধা দেয় আর কেইবা ?

স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যকে দুচোখে দেখতে না পারলেও কোনো কুকর্ম করার সময় একজোট হয়ে

যায় । কারণ ? ওদের প্যাশন একই । সেটা হল লালসা । তার জন্য যত নিচে নামতে হোক্ না কেন তারা ভ্রূক্ষেপ করেনা মোটেই ।

কারণ ঐ জিড্ডুর আর রজনীশের শিক্ষা , মহাবিশ্ব স্বয়ম্ভূ আর কাজ ও তার ফলই সবই । বেশি বাজে কাজ হয়ে গেলে ব্যাঙ্কের এই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে ঐ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সাফার করে দিও তাহলেই হয়ে গেলো !

কাজে কাজেই বয়ে চলে পরম শিক্ষার ধারাপাত নিজ গতিতে ।

জীবনটা তো আদতে একটি ব্যালেন্সশীট তাই না ?

জহুরির মতন চোখে চেয়ে বলে ওঠে আমোদ গজানন , সে অনেক কাল আগে । তখন রশ্মি মানে

যে গল্পটি বলছিলো সে বলে যে উত্তরদাতা অর্থাৎ ওরই আরেক স্যাঙাৎ বলে ওঠে , সেসবই তো এখানের জন্য গ্রাহ্য হবে কিন্তু মরে গেলে ?

তখন যমের দুয়ারে কি শালা জিড্ডু নাকি রজনীশ আমাদের বাঁচাতে আসবে ? হয়ত দেখা হলেও বলে দেবে -- ধূস্ মাদার চোদ , তোদের তো চিনিই না ! রজনীশ তো জিনিস ছিলো মাইরি , তা জিড্ডুও

কি ব্যাকস্টেজে ব্লু ফিল্ম দেখতো আর সেভেন এক্স করতো ? মালটা বলেনা সবাই সমান ? ওর কাছে কি মাগী আর কি কুত্তা সবই তো এক !

এই অশ্লীল বাক্যালাপের উত্তরে আমোদ গজানন সেদিন ঠিক কি বলেছিলো তা আর রশ্মির কান অবধি এসে পৌঁছাই নি কারণ কথাগুলো ছিলো অপরিষ্কার ও অত্যন্ত নিচু গলায় । কারণ দুজনেই তখন নেশায় ঢুলছে । তবে মনে হয় সে জড়ানো গলায় বলেছিলো সেদিন , **আরে ছাড় তো কেউ মরেনা । শুধু বডিটা ফিনিশ হয় , মরতা হ্যায় কৌন ? বার বার আসবি সব কর্ম ফিক্স হয়ে যাবে ।**

তখন ছিলো সারা মহলে এক গাঢ় নৈ:শব্দ । বাঁকা চাঁদ দাঁত বার করে হাসছে যেন তার সবই জানা কিন্তু বলবে কেন ? চাঁদকে তো হানিট্র্যাপিং করা সম্ভব নয় । দূরে একটা শেঁয়ালের ডাক শোনা যায় কেমন মাদকতা ছড়ায় বাতাসে যেন বলে কে জেগে আছে ? শুনেছো শয়তানের বাঁশির আওয়াজ ? সাবধান ! তোমাকে গিলে খেতে আসছে !

রাতজাগা পাখির ডাকে জেগে ওঠে শঙ্খিনী, ডাকিনী , নাগিনীর সাথীরা , নিশি ডাকা এই বন্ধ দুয়ারে- ডাকাতে কালীর মন্দির প্রাঙ্গনে ।

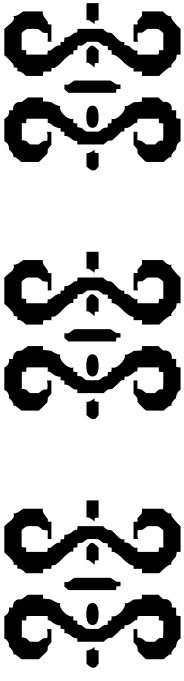

ইতি -তোমারই সারেঙ্গী

এই ছিলো সারেঙ্গীর সবকটি ই-পত্রের সারাংশ ।

মনের দুয়ারে না থাকলেও তোমারই লিখে থাকে অভ্যাসবশতঃ হয়ত ,সারেঙ্গী সেই মেয়েটি যার আবহবিদ্ হবার বাসনা তো ছিলই তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাও ছিলো আর অদ্ভুত একটি ক্ষমতা ছিলো আবহাওয়া সম্পর্কে আবহদপ্তরের মতন পূর্বাভাস দেবার । পুরোপুরি মিলে যেতো । রহস্য জনক এই ক্ষমতা তার শৈশব থেকেই ছিলো । সাইকিক পাওয়ার । কিন্তু টিপিক্যাল ৮০ শতাংশ ভারতীয় মতন তার প্রতিভা ধামাচাপাই থেকে গেলো । নাহলে হয়ত এই ই-পত্রের সাত নম্বর ইমেলেটি তাকে নিয়েই লেখা হতো ।।

সাইন আউট ।।

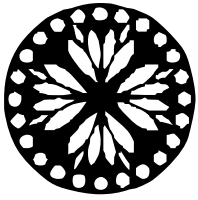

THE END